উচ্চশিক্ষা

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে কেন পিছিয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সনদনির্ভর প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে

মো. আবু তালেব

প্রকাশ: ২৪ মে ২০২৬ | ১৬:২৯

দেশের উচ্চশিক্ষার মান, গবেষণার সক্ষমতা এবং জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটে তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থানের মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং কেবল মর্যাদার বিষয় নয়; এটি অর্থনীতি, প্রযুক্তি, গবেষণা, উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ সূচক। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এখনো কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি। কেন পিছিয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়?

কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫৮৪তম। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৭৬১ থেকে ৭৭০ এর মধ্যে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ৯৫১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে। এছাড়া দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ১২০০ বা তারও নিচের স্তরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে বিশ্বের শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠানগুলো। ভারতের আইআইটি ও আইআইএসসির মতো প্রতিষ্ঠানও এখন বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করছে। এই তুলনা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার দুর্বলতাকে স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণে গবেষণার মান, সাইটেশন, একাডেমিক সুনাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, আন্তর্জাতিকীকরণ, কর্মসংস্থান সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ এই সূচকগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে। এর অন্যতম প্রধান কারণ গবেষণার দুর্বলতা।
বিশ্ববিদ্যালয় মানেই জ্ঞান সৃষ্টি ও গবেষণার কেন্দ্র। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এখনো প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে। গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট নেই, আধুনিক গবেষণাগারের অভাব রয়েছে, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা আছে এবং গবেষণাবান্ধব পরিবেশও দুর্বল। অনেক শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ সামলাতে হয়, ফলে গবেষণার জন্য সময় ও সুযোগ কমে যায়। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাপত্র, পেটেন্ট ও উদ্ভাবনের সংখ্যাও অত্যন্ত সীমিত।

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে। হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, এমআইটি কিংবা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর শুধু পাঠদান নয়, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেই বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো মুখস্থনির্ভর ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা ও গবেষণামুখী মনোভাব গড়ে তোলার পরিবর্তে কেবল সনদ অর্জনের প্রতিযোগিতা বেশি দেখা যায়।

আরেকটি বড় কারণ হলো শিক্ষার মানের অসমতা। দেশে বর্তমানে সরকারি ৫৭টি, বেসরকারি ১১৬টি, আন্তর্জাতিক ২টি সব মিলিয়ে ১৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু সংখ্যার এই দ্রুত বৃদ্ধি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, গবেষণা সুবিধা নেই, এমনকি কিছু প্রতিষ্ঠানে মৌলিক একাডেমিক পরিবেশও দুর্বল। ফলে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটলেও গুণগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত হয়নি।

শিক্ষক নিয়োগ ও মানোন্নয়নের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং গবেষণাভিত্তিক। সেখানে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, গবেষণা দক্ষতা ও একাডেমিক অবদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সবসময় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না। কখনো কখনো দলীয় বা ব্যক্তিগত বিবেচনা প্রাধান্য পায়। ফলে একাডেমিক উৎকর্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অনেক শিক্ষক বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার সুযোগ পেলেও দেশে ফিরে পর্যাপ্ত গবেষণা সহায়তা পান না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রভাবও বড় সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণ, শিক্ষক রাজনীতি, সেশনজট ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব শিক্ষার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেক সময় উপাচার্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, তখন গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হলে একাডেমিক স্বাধীনতা ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন নিশ্চিত করা জরুরি।

আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর একটি হলো বিদেশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, যৌথ গবেষণা এবং বৈশ্বিক একাডেমিক নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণও সীমিত। ফলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ব উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারার সঙ্গে শক্ত সংযোগ গড়ে তুলতে পারছে না।

পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও রয়েছে বড় অসামঞ্জস্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটি ও জলবায়ু পরিবর্তনভিত্তিক শিক্ষায়। অথচ আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এখনো পুরোনো কাঠামোতে আটকে আছে। শিল্পখাতের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকর সম্পর্ক না থাকায় শিক্ষার্থীরা বাস্তব দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার উদ্বেগজনক। এটি প্রমাণ করে, ডিগ্রি বাড়লেও দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

শিক্ষাখাতে বাজেট সংকটও বড় বাস্তবতা। ইউনেস্কো শিক্ষা খাতে জিডিপির উল্লেখযোগ্য অংশ বিনিয়োগের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশে শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ এখনো তুলনামূলক কম। গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ অপরিহার্য। শুধু নতুন ভবন নির্মাণ বা বিভাগ খোলার মাধ্যমে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় না; দরকার আধুনিক গবেষণাগার, ডিজিটাল লাইব্রেরি, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষক এবং গবেষণাবান্ধব পরিবেশ।

তবে আশার দিকও রয়েছে। দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ধীরে ধীরে অগ্রগতি করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক র‍্যাঙ্কিংয়েও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করেছে। এটি প্রমাণ করে, পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে অগ্রগতি সম্ভব।

এখন প্রয়োজন বাস্তবমুখী ও সাহসী সংস্কার। প্রথমত, গবেষণায় বড় বিনিয়োগ করতে হবে এবং গবেষণাভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে মেধা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পঞ্চমত, পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী ও দক্ষতাভিত্তিক করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় রাতারাতি তৈরি হয় না। চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া কিংবা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই দশকে পরিকল্পিত বিনিয়োগ, গবেষণায় গুরুত্ব এবং একাডেমিক সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশও পারে, যদি আমরা সত্যিকার অর্থে শিক্ষা ও গবেষণাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিই।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে যাওয়া কেবল মর্যাদার প্রশ্ন নয়; এটি দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। তাই এখনই সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সনদনির্ভর প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রে রূপান্তর করার। অন্যথায় বিশ্ব প্রতিযোগিতার এই যুগে আমরা আরও পিছিয়ে পড়ব।

ড. মো. আবু তালেব: অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়